ক্ষুণ্ণ হয়েছে।

প্রশ্ন : ২। ভারতের রাষ্ট্রপতির ক্ষমতা ও কার্যাবলি আলোচনা করো।
[Discuss the powers and functions of President of India.]

উত্তর। ভারতের রাষ্ট্রপতির ক্ষমতা ও কার্যাবলি

ভারতে সংসদীয় শাসনব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। এই শাসনব্যবস্থায় নিয়মতান্ত্রিক শাসক হলেন রাষ্ট্রপতি। সংবিধানের ৫৩(১) ধারা অনুসারে দেশের যাবতীয় শাসনতান্ত্রিক ক্ষমতার অধিকারী হলেন রাষ্ট্রপতি। বাস্তবে নিয়মতান্ত্রিক শাসক হিসাবে রাষ্ট্রপতির ক্ষমতা ও কার্যাবলিকে কয়েকটি ভাগে ভাগ করে আলোচনা করা যায়। যথা—(ক) শাসনসংক্রান্ত ক্ষমতা, (খ) আইনসংক্রান্ত ক্ষমতা, (গ) অর্থসংক্রান্ত ক্ষমতা, (ঘ) বিচারসংক্রান্ত ক্ষমতা, (ঙ) জরুরি অবস্থা বিষয়ক ক্ষমতা এবং (চ) অন্যান্য কয়েকটি বিষয়ে ক্ষমতা।

(ক) শাসন-সংক্রান্ত ক্ষমতা :

সংবিধানের ৫৩(১) নং ধারা অনুসারে ভারতের রাষ্ট্রপতির হাতে সকল রকমের শাসনসংক্রান্ত ক্ষমতা ন্যস্ত করা হয়েছে। এই ক্ষমতাগুলি হল—

❍ **নিয়োগ-সংক্রান্ত ক্ষমতা :** নিয়োগসংক্রান্ত ক্ষমতা— ভারতের রাষ্ট্রপতির একটি গুরুত্বপূর্ণ শাসনসংক্রান্ত ক্ষমতা। এই ক্ষমতাবলে তিনি যাঁদের নিয়োগ করতে পারেন, তাঁরা হলেন— প্রধানমন্ত্রী এবং মন্ত্রীসভার অন্যান্য সদস্যগণ, অ্যাটর্নি জেনারেল, ভারতের কম্পট্রোলার ও অডিটর জেনারেল, সুপ্রিমকোর্ট ও হাইকোর্টের বিচারপতিগণ, বিভিন্ন রাজ্যের রাজ্যপালগণ, কেন্দ্রীয় রাষ্ট্রকৃত্যকের সদস্যবৃন্দ, নির্বাচন কমিশনারগণ, ভাষা কমিশনের সদস্যবৃন্দ, অর্থ-কমিশনের সভাপতি এবং অন্যান্য সদস্যবৃন্দ, ভাষাগত সংখ্যালঘুদের জন্য নিযুক্ত বিশেষ আধিকারিকগণ, তপশিলি জাতি ও তপশিলি উপজাতিদের জন্য একজন বিশেষ আধিকারিক, আন্তঃরাজ্য পরিষদের সদস্যগণ, অনুন্নত শ্রেণি বিষয়ে অবগত হওয়ার জন্য অনুসন্ধান কমিশনের সদস্যগণ প্রমুখ।

❍ **পদচ্যুতি-সংক্রান্ত ক্ষমতা :** রাষ্ট্রপতি গুরুত্বপূর্ণ কিছু পদাধিকারীকে পদচ্যুত করতে পারেন। এঁদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলেন— মন্ত্রীসভার সদস্যগণ, বিভিন্ন রাজ্যে নিযুক্ত রাজ্যপালগণ, অ্যাটর্নি জেনারেল, কেন্দ্রীয় রাষ্ট্রকৃত্যক কমিশনের সভাপতি ও সদস্যগণ, রাজ্য-রাষ্ট্রকৃত্যক কমিশনের সভাপতি ও সদস্যগণ, সুপ্রিমকোর্ট ও হাইকোর্টের বিচারপতিগণ এবং নির্বাচন কমিশনার প্রমুখ। উল্লেখযোগ্য যে, রাষ্ট্রকৃত্যক কমিশনের সদস্যদের পদচ্যুত করার জন্য সুপ্রিমকোর্টের তদন্তের রিপোর্টের প্রয়োজন হয় এবং নির্বাচন কমিশনারকে পদচ্যুত করার জন্য সংসদের সুপারিশের প্রয়োজন হয়।

❍ **সামরিক ক্ষমতা :** ভারতের রাষ্ট্রপতি স্থল, নৌ ও বিমানবাহিনীর প্রধানদের নিয়োগ করেন। এক্ষেত্রে তিনি জাতীয় প্রতিরক্ষা কমিটির প্রধান হিসাবে কাজ করেন। তিনি সংসদ বা পার্লামেন্টের অনুমোদন সাপেক্ষে যুদ্ধ ঘোষণা ও শান্তি স্থাপন করতে পারেন।

❍ **কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলের দায়িত্ব :** রাষ্ট্রপতির নামে ভারতের কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলগুলি শাসিত হয়। রাষ্ট্রপতি প্রতিটি কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলের শাসনকার্যের জন্য একজন করে প্রশাসক নিয়োগ করতে পারেন।

❍ **পররাষ্ট্র-সংক্রান্ত কাজ :** ভারতের রাষ্ট্রপতির পররাষ্ট্র-সংক্রান্ত কাজটি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে তিনিই দেশের প্রধান প্রতিনিধি। তা ছাড়া তিনি যেমন বিদেশ থেকে আসা কূটনীতিকদের গ্রহণ করেন, তেমনি ভারতের রাষ্ট্রদূতদেরও তিনি বিদেশে পাঠান। উল্লেখযোগ্য যে, রাষ্ট্রপতি বিদেশের সঙ্গে যেসব চুক্তি স্থাপন করেন, তা সংসদের অনুমোদন-সাপেক্ষ হতে হয়।

(খ) আইন-সংক্রান্ত ক্ষমতা :

ভারতের পার্লামেন্টের অবিচ্ছেদ্য অংশ হিসাবে রাষ্ট্রপতি আইনসংক্রান্ত ক্ষেত্রেও কতকগুলি গুরুত্বপূর্ণ ক্ষমতা ভোগ করেন। আইনসংক্রান্ত ক্ষেত্রে এই ক্ষমতাগুলি হল—

❍ **অধিবেশন-সংক্রান্ত ক্ষমতা :** ভারতের রাষ্ট্রপতি লোকসভা ও রাজ্যসভার অধিবেশন আহ্বান করতে পারেন এবং অধিবেশন স্থগিত রাখতে পারেন। আবার কার্যকাল শেষ হবার আগে তিনি লোকসভা ভেঙে দিতেও পারেন।

❍ **সদস্য মনোনয়নের ক্ষমতা :** রাষ্ট্রপতি রাজ্যসভায় ১২ জন এবং লোকসভায় ২ জন সদস্য মনোনয়ন করতে পারেন।

○ **ভাষণদান ও message প্রদানের ক্ষমতা :** সংবিধানের ৮৬(১) নং ধারা অনুসারে রাষ্ট্রপতি সংসদের যে-কোনো কক্ষে অথবা উভয়কক্ষের যৌথ অধিবেশনে ভাষণ দেন। তা ছাড়া তিনি সংসদের যে-কোনো কক্ষে আলোচনারত কোনো বিলের ব্যাপারে message পাঠাতে পারেন। প্রত্যেক সাধারণ নির্বাচনের পর তিনি লোকসভার অধিবেশনের শুরুতে উদ্‌বোধনী ভাষণ দেন।

○ **যৌথ অধিবেশন :** সংসদের উভয়কক্ষে অর্থাৎ রাজ্যসভা ও লোকসভার মধ্যে যদি কোনো কারণে মতবিরোধ বাধে, তাহলে সেই মতবিরোধের নিষ্পত্তির জন্য রাষ্ট্রপতি যৌথ অধিবেশন আহ্বান করতে পারেন।

○ **বিলে সম্মতিদানের ক্ষমতা :** কোনো বিল আইনে পরিণত হবার জন্য রাষ্ট্রপতির সম্মতির প্রয়োজন হয়। প্রতিটি বিল সংসদের উভয়কক্ষ কর্তৃক গৃহীত হবার পর তা রাষ্ট্রপতির কাছে পাঠানো হয় তাঁর সম্মতি লাভের জন্য। অর্থবিল ছাড়া সাধারণ বিলের ক্ষেত্রে রাষ্ট্রপতি পুনরায় বিবেচনার জন্য পাঠাতে পারেন। কিন্তু সংসদ দ্বারা যদি দ্বিতীয়বার ওই বিলটি গৃহীত হয়, তাহলে রাষ্ট্রপতি সংশ্লিষ্ট বিলটিতে সম্মতি জানাতে বাধ্য। তিনি অর্থবিল পুনরায় বিবেচনার জন্য সংসদের সংশ্লিষ্ট কক্ষে পাঠাতে পারেন না। আবার বিলটি সংবিধান-সংশোধন সংক্রান্ত হলে তিনি তাতে সম্মতি জানাতে বাধ্য থাকেন।

○ **ভেটো ক্ষমতা :** যে ক্ষমতা বলে রাষ্ট্রপতি বিল বাতিল করতে পারেন, তাকে বলে ভেটো ক্ষমতা। রাষ্ট্রপতি তিন ধরনের ভেটো ক্ষমতা প্রয়োগ করতে পারেন। যথা— (১) পূর্ণাঙ্গ ভেটো, (২) স্থগিতমূলক ভেটো এবং (৩) পকেট ভেটো।

○ **জরুরি আইন প্রণয়নের ক্ষমতা :** সংসদের অধিবেশন বন্ধ থাকলে রাষ্ট্রপতি জরুরি আইন বা Ordinance জারি করতে পারেন। রাষ্ট্রপতি কেবলমাত্র সেইসব বিষয়ের ওপর Ordinance জারি করতে পারেন, সংসদ যে বিষয়সমূহকে আইনে পরিণত করতে পারে বা যে বিষয়ে আইন প্রণয়ন করতে পারে। তবে সংসদের অধিবেশন শুরু হলে এই Ordinance ৪৫ দিনের মধ্যে অনুমোদিত হতে হবে, নতুবা Ordinance বাতিল হয়ে যাবে।

(গ) অর্থ-সংক্রান্ত ক্ষমতা :

সংবিধান অনুসারে রাষ্ট্রপতি সংসদের অর্থ-বিষয়ক ক্ষমতার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট। রাষ্ট্রপতির এই অর্থ-বিষয়ক ক্ষমতাগুলি হল—

○ **অর্থবিল পেশ :** লোকসভায় অর্থবিল পেশ করার আগে রাষ্ট্রপতির সম্মতি দরকার হয়। তাঁর সুপারিশ ছাড়া ব্যয়-বরাদ্দের কোনো দাবি সংসদে উত্থাপন করা যায় না।

○ **অর্থ কমিশন :** প্রতি ৫ বছর পর রাষ্ট্রপতি রাজস্ব বণ্টনের জন্য একটি অর্থ কমিশন গঠন করতে পারেন এবং এর সুপারিশসমূহ সংসদে পেশ করতে পারেন।

○ **আকস্মিক ব্যয় :** ভারতে আকস্মিক তহবিলের (Contingency Fund) কাজ হল জরুরিকালীন ব্যয় নির্বাহ করা। রাষ্ট্রপতি আকস্মিক ব্যয় নির্বাহের জন্য আকস্মিক তহবিল থেকে অর্থ মঞ্জুর করতে পারেন। তবে এক্ষেত্রে তা সংসদ কর্তৃক অনুমোদিত হতে হয়।

○ **ঋণ-সংক্রান্ত প্রস্তাব :** অর্থসংক্রান্ত এমন কতকগুলি ক্ষেত্র আছে, যেখানে রাষ্ট্রপতির সম্মতি প্রয়োজন। যেমন—কর, ঋণসংক্রান্ত রাজস্ব প্রস্তাব, ঋণসংক্রান্ত রাজস্ব প্রস্তাব বিষয়ে সংশোধনী প্রভৃতি।

(ঘ) বিচার-সংক্রান্ত ক্ষমতা :

ভারতের রাষ্ট্রপতি কতকগুলি বিচারবিষয়ক ক্ষমতা ভোগ করেন। যেমন—

○ **নিয়োগসংক্রান্ত ক্ষমতা :** সুপ্রিমকোর্ট এবং হাইকোর্টের বিচারপতিগণ রাষ্ট্রপতি দ্বারা নিযুক্ত হন। আবার সংসদের সুপারিশ অনুসারে রাষ্ট্রপতি তাঁদের পদচ্যুতও করতে পারেন।

○ **দণ্ড হ্রাসের ক্ষমতা :** রাষ্ট্রপতি দণ্ড হ্রাস সংক্রান্ত কতকগুলি ক্ষমতা ভোগ করেন। যেমন—ফৌজদারি মামলায় দণ্ডিত ব্যক্তির দণ্ড হ্রাস, অথবা দণ্ডিত ব্যক্তিকে ক্ষমা করা, অথবা দণ্ডদান স্থগিত রাখা, মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত ব্যক্তিকে ক্ষমা করা, অথবা মৃত্যুদণ্ড রোধ করে অন্য কোনো দণ্ড দেওয়া।

(ঙ) জরুরি অবস্থা বিষয়ক ক্ষমতা :

সংবিধান অনুসারে রাষ্ট্রপতি তিন ধরনের জরুরি অবস্থা ঘোষণা করতে পারেন। যেমন—

○ **জাতীয় জরুরি অবস্থা ঘোষণা :** ভারতের সংবিধানের ৩৫২নং ধারায় রাষ্ট্রপতির জাতীয় জরুরি অবস্থা ঘোষণার কথা বলা হয়েছে। ওই ধারা অনুসারে রাষ্ট্রপতি যদি মনে করেন যে, যুদ্ধ, বহিরাক্রমণ অথবা দেশের মধ্যে সশস্ত্র কোনো বিদ্রোহজনিত কারণে সমগ্র ভারত বা ভারতের কোনো অংশের নিরাপত্তা বিঘ্নিত হয়েছে অথবা এরূপ ঘটার আশঙ্কা দেখা দিয়েছে, তাহলে তিনি সমগ্র দেশে বা সংশ্লিষ্ট অংশে এরূপ ঘোষণা করতে পারেন। সংসদের উভয়কক্ষ দ্বারা জাতীয় জরুরি অবস্থা এক মাসের মধ্যে অনুমোদিত হয়, অনুমোদিত না-হলে তা বাতিল হয়ে যাবে।

○ **শাসনতান্ত্রিক অচলাবস্থা :** সংবিধানের ৩৫৬ নং ধারায় রাজ্যে শাসনতান্ত্রিক অচলাবস্থা ঘোষণার কথা বলা হয়েছে। রাষ্ট্রপতি যদি কোনো রাজ্যের রাজ্যপাল বা অন্য কোনো সূত্র থেকে জানতে পারেন যে, সংশ্লিষ্ট রাজ্যে সংবিধান অনুযায়ী শাসনব্যবস্থা পরিচালিত হচ্ছেনা অথবা ওই রাজ্যে শাসনব্যবস্থা চালানো সম্ভব হচ্ছে না, তাহলে তিনি যে জরুরি অবস্থা সংক্রান্ত ঘোষণা জারি করেন, তাকে বলা হয় শাসনতান্ত্রিক অচলাবস্থা। প্রধানমন্ত্রীর পরামর্শ মতো তিনি এই ঘোষণা করতে পারেন।

○ **আর্থিক জরুরি অবস্থা ঘোষণা :** সংবিধানের ৩৬০ নং ধারায় রাষ্ট্রপতির আর্থিক জরুরি অবস্থা ঘোষণার কথা বলা হয়েছে। ওই ধারায় বলা হয়েছে যে, সমগ্র ভারত অথবা ভারতের কোনো অংশে আর্থিক স্থায়িত্ব বা সুনাম ক্ষুণ্ণ হওয়ার অবস্থা দেখা দিয়েছে, তাহলে রাষ্ট্রপতি আর্থিক জরুরি অবস্থা জারি করতে পারেন। এই ঘোষণা অবশ্য সংসদের উভয়কক্ষ দ্বারা অনুমোদিত হতে হবে।

(চ) অন্যান্য ক্ষমতা :

এ ছাড়াও রাষ্ট্রপতি আরও কিছু ক্ষমতা ভোগ করেন। এগুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল—

(ক) কেন্দ্রীয় রাষ্ট্রকৃত্যক কমিশনে কতজন সদস্য থাকবেন, তাদের কার্যকালের মেয়াদ কী হবে, চাকরির শর্ত কী হবে প্রভৃতি ক্ষেত্রে রাষ্ট্রপতি নিয়ম প্রণয়ন করতে পারেন।

(খ) জনস্বার্থ-সম্পর্কিত যদি কোনো প্রশ্ন দেখা দেয়, সেক্ষেত্রে রাষ্ট্রপতি বিষয়টি সুপ্রিম-কোর্টের মতামতের জন্য পাঠাতে পারেন।

● পদমর্যাদা

ভারতের রাষ্ট্রপতিকে প্রকৃত শাসক বলা যায় কিনা, তা নিয়ে পরস্পরবিরোধী নানা মত সৃষ্টি হয়েছে। অনেকে মনে করেন যে, ভারতের রাষ্ট্রপতি হলেন আনুষ্ঠানিক বা নিয়মতান্ত্রিক

ক্ষুণ্ণ করে বলে অনেকে একে গণতন্ত্রেরও বিরোধী বলে উল্লেখ করেছেন। আবার রাজ্যগুলিতে রাষ্ট্রপতির শাসন চালু হলে আমলাতন্ত্রের কর্তৃত্ব কেন্দ্রীভূত হয়, যা গণতন্ত্রের অনুপন্থী নয়।

প্রশ্ন : ৪। ভারতের প্রধানমন্ত্রীর ক্ষমতা ও কার্যাবলি সম্পর্কে একটি টীকা লেখো।
[Write a note on the Power and Functions of the Prime Minister of India.]

উত্তর। প্রধানমন্ত্রীর ক্ষমতা ও কার্যাবলি

ভারতে সংসদীয় শাসনব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। এই শাসনব্যবস্থায় প্রধানমন্ত্রী ও ক্যাবিনেটের একাধিপত্য প্রতিষ্ঠিত হয়। প্রধানমন্ত্রী ক্যাবিনেটের নেতা হিসাবে গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব পালন করেন। প্রধানমন্ত্রীই হলেন দেশের প্রকৃত শাসক-প্রধান। ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রীর কার্যাবলির মতো ভারতের প্রধানমন্ত্রীর বিভিন্ন ভূমিকা নির্ধারিত হয়েছে। ভারতে প্রধানমন্ত্রীর গুরুত্বপূর্ণ ক্ষমতা ও কার্যাবলি হল—

(১) মন্ত্রীপরিষদের প্রধান হিসাবে ভূমিকা : প্রধানমন্ত্রী হলেন কেন্দ্রীয় মন্ত্রীপরিষদের প্রধান। তিনি তাঁর পছন্দমতো এবং বিবেচনা অনুসারে মন্ত্রীসভার অন্যান্য মন্ত্রীদের মনোনীত করেন এবং তাঁর পরামর্শমতো রাষ্ট্রপতি এইসব মন্ত্রীদের নিয়োগ করেন। প্রধানমন্ত্রী অন্যান্য মন্ত্রীদের মধ্যে দপ্তর বণ্টন করে দেন। কোন্ কোন্ মন্ত্রী ক্যাবিনেটে থাকবেন, কোন্ কোন্ মন্ত্রীকে ক্যাবিনেটে নেওয়া হবে, কে উপমন্ত্রী হবেন বা কে রাষ্ট্রমন্ত্রী হবেন প্রভৃতি সকল বিষয়ে প্রধানমন্ত্রীই সকল সিদ্ধান্ত নিয়ে থাকেন। তিনি ক্যাবিনেটের সভায় সভাপতিত্ব করেন এবং বিভাগগুলির কাজের মধ্যে সমন্বয় করেন। আবার বিভাগগুলির মধ্যে কোনোরূপ মতভেদ দেখা দিলে প্রধানমন্ত্রী সেই মতভেদ বা বিরোধের মীমাংসা করে ক্যাবিনেটে ঐক্যকে বজায় রাখতে সচেষ্ট হন। কোনো মন্ত্রীর সঙ্গে প্রধানমন্ত্রীর মতভেদ দেখা দিলে সেই মন্ত্রীকে তিনি পদত্যাগের জন্য বলতে পারেন।

(২) ক্যাবিনেটের প্রধান হিসাবে ভূমিকা : ক্যাবিনেটের কাজ হল নীতি-নির্ধারণে প্রধানমন্ত্রীকে সাহায্য করা। কাকে কোন্ শ্রেণির মন্ত্রী করা হবে, ক্যাবিনেট মন্ত্রী কতজন হবেন এবং কারা হবেন, সে ব্যাপারে প্রধানমন্ত্রীই সিদ্ধান্ত নেন। প্রধানমন্ত্রী ঠিক করেন রাষ্ট্রমন্ত্রী থেকে কাকে ক্যাবিনেট মন্ত্রী করা হবে। প্রধানমন্ত্রী তাঁর বিশ্বস্ত, অনুগত এবং অভিজ্ঞ কয়েকজন ক্যাবিনেট মন্ত্রী নিয়ে একটি অন্তরঙ্গ ক্যাবিনেট গঠন করতে পারেন, যাঁরা বিভিন্ন কাজে তাঁকে যুক্তি, পরামর্শ ও সিদ্ধান্ত দিয়ে সাহায্য করবেন। একে 'হেঁশেল ক্যাবিনেট' বা 'কিচেন ক্যাবিনেট' বলা হয়। প্রধানমন্ত্রীর সিদ্ধান্ত গ্রহণের মূল কেন্দ্র হিসাবে 'কিচেন ক্যাবিনেট'-ই কাজ করে। তিনি ক্যাবিনেটের সভায় সভাপতিত্ব করেন এবং সভার বিষয়সূচি ঠিক করেন। প্রধানমন্ত্রী মন্ত্রীদের মধ্যে দপ্তর বণ্টন ও পুনর্বণ্টন করতে পারেন।

(৩) রাষ্ট্রপতির প্রধান পরামর্শদাতা রূপে প্রধানমন্ত্রী : প্রধানমন্ত্রী হলেন রাষ্ট্রপতির পরামর্শদাতা। তিনি কোনো দপ্তরের কার্য পরিচালনা বিষয়ে রাষ্ট্রপতিকে পরামর্শ দিতে পারেন। আবার রাষ্ট্রপতি যাঁদের নিযুক্ত করেন, অর্থাৎ কোনো রাজ্যের রাজ্যপাল, রাষ্ট্রদূত, অ্যাটর্নি-জেনারেল, কেন্দ্রীয় রাষ্ট্রকৃত্যকের সভাপতি এবং অন্য সদস্যবৃন্দ, নিয়ন্ত্রক ও মহাহিসাব পরীক্ষক, ভারতের নির্বাচন কমিশনার এবং কমিশনের অন্যান্য সদস্যবৃন্দ প্রমুখকে প্রধানমন্ত্রীর পরামর্শ অনুসারেই নিযুক্ত করেন। জরুরি অবস্থা সম্পর্কিত ঘোষণা, প্রজাতন্ত্র দিবসে উপাধি প্রদান, রাজ্যসভায় কাকে মনোনীত করা হবে প্রভৃতি ক্ষেত্রে প্রধানমন্ত্রীই রাষ্ট্রপতিকে পরামর্শ দেন এবং রাষ্ট্রপতি তার বাস্তবায়ন ঘটান।

(৪) লোকসভার নেতা হিসাবে ভূমিকা : লোকসভার সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের নেতা বা নেত্রী হলেন প্রধানমন্ত্রী। রাষ্ট্রপতি প্রধানমন্ত্রীর পরামর্শমতো লোকসভা এবং রাজ্যসভার অধিবেশন ডাকেন। অধিবেশন স্থগিত রাখার ব্যাপারেও প্রধানমন্ত্রীর পরামর্শ অনুসারে রাষ্ট্রপতি কাজ করেন। সংসদের অধিবেশন চলাকালীন সময়ে প্রধানমন্ত্রী সরকারের পক্ষ থেকে উত্থাপিত বিষয়গুলির তালিকা তৈরি করেন। মূল সিদ্ধান্ত তিনিই দিয়ে থাকেন। তিনি সংসদের দুটি কক্ষেই উপস্থিত থাকতে পারেন এবং আলোচনার সময়ে অংশ নিতে পারেন। লোকসভার নেতা বা নেত্রী হিসাবে তিনি সংসদের শৃঙ্খলারক্ষার জন্য স্পিকারকে সাহায্য করেন এবং বিরোধীপক্ষের মর্যাদা ও অধিকার সুরক্ষার ব্যাপারে সচেষ্ট থাকেন। সর্বোপরি, প্রধানমন্ত্রী সংসদে সরকারি নীতিসমূহের আলোচনা ও তার ব্যাখ্যা দেন এবং এ ব্যাপারে উত্থাপিত প্রশ্ন ও সমালোচনার যথোচিত উত্তর দিয়ে থাকেন।

(৫) বৈদেশিক নীতির ক্ষেত্রে ভূমিকা : ভারতের বৈদেশিক নীতি রূপায়ণ ও বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে প্রধানমন্ত্রীই সর্বাধিক ভূমিকা পালনকারী হিসাবে কাজ করেন। এক্ষেত্রে তিনি যেসব গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নেন, তা হল— (ক) আন্তর্জাতিক শান্তি ও নিরাপত্তা, (খ) জোট-নিরপেক্ষ নীতির বাস্তবায়ন, (গ) আণবিক অস্ত্র প্রতিযোগিতা বন্ধ করা, (ঘ) কমনওয়েলথ সম্মেলনে যোগদান, (ঙ) বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ আন্তর্জাতিক সম্মেলনে যোগদান প্রভৃতি। দেশের পররাষ্ট্র দপ্তর প্রধানমন্ত্রীর হাতে না-থাকলেও, যেহেতু প্রধানমন্ত্রী হলেন প্রকৃত শাসক-প্রধান, সেহেতু তিনি দেশের অভ্যন্তরে ও দেশের বাইরে বৈদেশিক নীতির প্রধান রূপকার হিসাবে কাজ করেন। বিদেশে তথা আন্তর্জাতিক সম্মেলনে তিনি যে বক্তব্য উপস্থাপন করেন, তা ভারতের বক্তব্য বলে বিবেচিত। আন্তর্জাতিক সন্ধি বা চুক্তির ব্যাপারে তিনি মুখ্য ভূমিকা গ্রহণ করেন। তিনি সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের সভায় ভারতের প্রতিনিধিত্ব করেন।

(৬) দলের নেতা হিসাবে প্রধানমন্ত্রীর ভূমিকা : প্রধানমন্ত্রী হলেন ক্ষমতাসীন দলের নেতা বা নেত্রী। তিনি সংসদের ভিতরে ও বাইরে তাঁর দলের মর্যাদা যাতে রক্ষিত হয়, সে ব্যাপারে সতর্ক থাকেন। তাঁর নজরে থাকে দলীয় ঐক্য ও সংহতি যেন কোনো বাধার সম্মুখীন না-হয়। প্রধানমন্ত্রীর দল একদিকে যেমন প্রধানমন্ত্রীকে সংসদের অভ্যন্তরে শক্তি ও উৎসাহ জোগায়, অন্যদিকে তেমনি দলও আশা করে নির্বাচনী প্রতিশ্রুতি রক্ষার ক্ষেত্রে প্রধানমন্ত্রী যথাসাধ্য কাজ করবেন। সরকার পরিচালনার দক্ষতা, দলীয় প্রতিশ্রুতির বাস্তবায়ন প্রভৃতির ওপর তাঁর দলের ভবিষ্যৎ রাজনৈতিক অবস্থান নির্ভর করে।

● **পদমর্যাদা :**

ভারতে সংসদীয় শাসনব্যবস্থা প্রবর্তিত হয়েছে। এই ব্যবস্থায় একজন নিয়মতান্ত্রিক ও একজন প্রকৃত শাসক থাকেন। রাষ্ট্রপতি হলেন নিয়মতান্ত্রিক প্রধান, কিন্তু প্রকৃত শাসক হলেন প্রধানমন্ত্রী। রাষ্ট্রপতি যেসব ক্ষমতা প্রয়োগ করেন বা যেসব উচ্চপদাধিকারীদের নিয়োগ করেন, সব ক্ষেত্রেই প্রধানমন্ত্রীর পরামর্শ অনুযায়ী তা সম্পাদিত হয়। ভারতের রাজনৈতিক ব্যবস্থায় তিনি হলেন সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তি। এই কারণে তাঁকে কতকগুলি রূপক আখ্যায় ভূষিত করা হয়। যেমন— প্রধানমন্ত্রী হলেন সমকক্ষদের মধ্যে প্রথম; আবার এ কথাও বলা হয় যে, তিনি হলেন নক্ষত্রসমূহের মধ্যে চন্দ্র-সদৃশ। কিন্তু প্রধানমন্ত্রীর পদমর্যাদা নির্ভর করে তাঁর ব্যক্তিত্ব, সমসাময়িক ব্যবস্থায় তাঁর পদক্ষেপ, জনপ্রিয়তা, চারিত্রিক দৃঢ়তা, দূরদর্শিতা, তাঁর নিজের দলের উপর যেমন, তেমনি বিরোধী দলের ওপর প্রভাব প্রভৃতি।

প্রশ্ন : ৬। ভারতের রাষ্ট্রপতি এবং প্রধানমন্ত্রীর মধ্যে সম্পর্ক আলোচনা করো।
[Discuss the relations between the President and the Prime Minister of India.]

উত্তর। ভারতের রাষ্ট্রপতি ও প্রধানমন্ত্রীর সম্পর্ক

সংসদীয় গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় একজন নিয়মতান্ত্রিক শাসক-প্রধান থাকেন, তাঁর নামে দেশের সমস্ত শাসনকার্য পরিচালিত হয়; কিন্তু প্রকৃত ক্ষমতা ভোগ করেন প্রকৃত শাসক, যিনি জনগণের দ্বারা প্রত্যক্ষ ভোটের মাধ্যমে নির্বাচিত হন। ভারতেও অনুরূপ সংসদীয় গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থা প্রবর্তিত হয়েছে। এই ব্যবস্থায় নিয়মতান্ত্রিক শাসক-প্রধান হলেন রাষ্ট্রপতি। প্রকৃত ক্ষমতা আছে প্রধানমন্ত্রীর হাতে। অর্থাৎ, প্রকৃত শাসক হলেন প্রধানমন্ত্রী। প্রধানমন্ত্রী জনগণের প্রত্যক্ষ ভোটের দ্বারা নির্বাচিত হন। ভারতে রাষ্ট্রপতি ও প্রধানমন্ত্রীর মধ্যে সম্পর্ক-সমূহ আলোচনা করলে যে বিষয়গুলি পাওয়া যায়, তা হল—

প্রথমত, প্রধানমন্ত্রী রাষ্ট্রপতি দ্বারা নিযুক্ত হন। লোকসভায় যে দল সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করে, সেই দলের নেতা বা নেত্রীকেই রাষ্ট্রপতি প্রধানমন্ত্রী পদে নিযুক্ত করেন। লোকসভায় কোনো দল এককভাবে সংখ্যাগরিষ্ঠতা না-পেলে, নির্বাচনে যে দল বেশি আসন পেয়েছে অথবা কোনো জোট গঠিত হলে জোটের নেতাকে রাষ্ট্রপতি প্রধানমন্ত্রী পদে নিযুক্ত করেন। তবে এক্ষেত্রে তিনি ওই নেতা বা নেত্রীকে নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে সংখ্যাগরিষ্ঠতা প্রমাণ করার নির্দেশ দিতে পারেন।

দ্বিতীয়ত, ভারতের সংবিধানে উল্লেখ করা হয়েছে যে, রাষ্ট্রপতিকে পরামর্শদানের জন্য একটি মন্ত্রীপরিষদ থাকবে—প্রধানমন্ত্রী হলেন এই মন্ত্রীপরিষদের প্রধান।

তৃতীয়ত, কার্যকাল শেষ হওয়ার আগেই কোনো কারণে যদি প্রধানমন্ত্রীর মৃত্যু হয়, তাহলে রাষ্ট্রপতি নতুন প্রধানমন্ত্রী নিয়োগ করতে পারেন। এক্ষেত্রে অবশ্য সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের পরবর্তী নেতাকেই তিনি আহ্বান করবেন।

চতুর্থত, প্রধানমন্ত্রী রাষ্ট্রপতি ও মন্ত্রীসভার মধ্যে যোগসূত্র রক্ষার কাজ করেন। শাসনকার্য পরিচালনার ব্যাপারে এবং আইনের প্রস্তাব সম্পর্কিত কার্যাবলি সম্পর্কে প্রধানমন্ত্রী রাষ্ট্রপতির কাছে সিদ্ধান্তগুলি উপস্থিত করেন।

পঞ্চমত, আবার রাষ্ট্রপতি প্রধানমন্ত্রীর কাছে আইন ও প্রশাসনিক প্রস্তাব সম্পর্কে কিছু জানতে চাইলে প্রধানমন্ত্রীর দায়িত্ব হল সে সম্পর্কে রাষ্ট্রপতিকে অবহিত করানো।

ষষ্ঠত, প্রধানমন্ত্রী ও তাঁর মন্ত্রীসভা যেসব নীতি গ্রহণ করে বা অন্যান্য কার্যাবলি পালন করে, সেইসব কৃতকর্মের জন্য লোকসভার কাছে তাঁদের দায়িত্বশীল থাকতে হয়। কিন্তু লোকসভার আস্থা হারালে রাষ্ট্রপতির নির্দেশে ওই প্রধানমন্ত্রী ও মন্ত্রীসভাকে পদত্যাগ করতে হয়।

সপ্তমত, শাসনসংক্রান্ত কোনো ব্যাপারে আবার রাষ্ট্রপতি প্রধানমন্ত্রীকে পরামর্শ দিতে পারেন।

পদপ্রার্থী হওয়ার যোগ্যতা থাকলে তিনি ওই পদের জন্য প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে পারবেন।

(চ) রাষ্ট্রপতি পদে নির্বাচনপ্রার্থীকে কমপক্ষে ৫০ জন নির্বাচক দ্বারা প্রস্তাবিত হতে হবে এবং একই সঙ্গে ৫০ জন নির্বাচক দ্বারা ওই নাম সমর্থিত হতে হবে।

● রাষ্ট্রপতির অপসারণ :

ভারতের রাষ্ট্রপতি ৫ বছরের জন্য নির্বাচিত হন। তাঁর কার্যকাল শেষ হওয়ার আগে সংবিধান ভঙ্গের অপরাধে (৫৬ নং ধারা) 'ইম্‌পিচমেন্ট' পদ্ধতি (৬১ নং ধারা) দ্বারা তাঁকে অপসারণ করা যায়।

'ইম্‌পিচমেন্ট' বলতে এমন একটি আধা-বিচার পদ্ধতিকে বোঝায়, যার দ্বারা পার্লামেন্টের যে-কোনো কক্ষে সংবিধান ভঙ্গের অভিযোগ উপস্থাপিত হতে পারে। রাষ্ট্রপতিকে পদচ্যুত করার ক্ষেত্রে—

(ক) সংসদের যে-কোনো কক্ষে সংবিধান ভঙ্গের প্রস্তাব সংবলিত অভিযোগটি উত্থাপন করতে হবে।

(খ) কমপক্ষে ১৪ দিন আগে এ-ব্যাপারে নোটিশ দিতে হবে।

(গ) যে কক্ষে অভিযোগ প্রস্তাবটি উত্থাপিত হবে, সেই কক্ষের মোট $\frac{১}{৪}$ অংশ সদস্যের দ্বারা প্রস্তাবটি স্বাক্ষরিত হতে হবে।

(ঘ) প্রস্তাবটি যে কক্ষে আনা হবে, সেই কক্ষের কমপক্ষে $\frac{২}{৩}$ অংশের সদস্যের সমর্থন পেলে তা অপর কক্ষে প্রেরিত হবে। অভিযোগ সম্পর্কে ওই অপর কক্ষটি অনুসন্ধান করবে। অনুসন্ধান কার্য চলার সময় রাষ্ট্রপতি স্বয়ং বা কোনো প্রতিনিধির দ্বারা আত্মপক্ষ সমর্থন করার সুযোগ পান।

(ঙ) অপর কক্ষটিতেও যদি প্রস্তাবটিকে $\frac{২}{৩}$ অংশ সদস্য সমর্থন করেন, তাহলে রাষ্ট্রপতিকে পদচ্যুত হতে হয়।

প্রশ্ন : ২। ভারতের রাষ্ট্রপতির ভেটো ক্ষমতাগুলি কী-কী?
[What are the Veto Powers of the President of India?]

উত্তর। রাষ্ট্রপতির ভেটো ক্ষমতা

ভেটো বলতে বোঝায় বিল নাকচ করার ক্ষমতা। কোনো বিল রাষ্ট্রপতির সম্মতি না-পেলে তা আইনে পরিণত হতে পারে না। প্রতিটি বিল সংসদের উভয়কক্ষে পাশ হওয়ার পর তা পাঠানো হয় রাষ্ট্রপতির সম্মতি লাভের জন্য। কিন্তু রাষ্ট্রপতি ওই বিলে সম্মতি জানাতেও পারেন, আবার নাও জানাতে পারেন। তাঁর তিন ধরনের ভেটো ক্ষমতা আছে। যথা— (ক) পূর্ণাঙ্গ ভেটো, (খ) স্থগিতমূলক ভেটো এবং (গ) পকেট ভেটো।

(ক) পূর্ণাঙ্গ ভেটো : পূর্ণাঙ্গ ভেটো প্রয়োগ করে রাষ্ট্রপতি সরাসরি কতকগুলি বিলকে বাতিল করে দিতে পারেন। এই বিলগুলি হল—

(১) কোনো বিল সংসদে গৃহীত হওয়ার পরেই যদি ওই মন্ত্রীসভা পদত্যাগ করে এবং নতুন মন্ত্রীসভা গঠিত হয় এবং নতুন মন্ত্রীসভা রাষ্ট্রপতিকে পরামর্শ দেয়, তাহলে ওই বিলটির ক্ষেত্রে রাষ্ট্রপতি পূর্ণাঙ্গ ভেটো প্রয়োগ করবেন। এক্ষেত্রে বিলটি বাতিল হয়ে যাবে।

(২) কোনো বেসরকারি বিল পাশ হলে ওই বিলের ক্ষেত্রে রাষ্ট্রপতি মন্ত্রীসভার পরামর্শ মতো ভেটো প্রয়োগ করতে পারেন। বিলটি এক্ষেত্রে বাতিল হয়ে যাবে।

(৩) কোনো রাজ্যবিল যদি রাষ্ট্রপতির সম্মতি লাভের আশায় সংরক্ষিত হয় এবং মন্ত্রীসভা এ ব্যাপারে রাষ্ট্রপতিকে পরামর্শ জানায়, তাহলে রাষ্ট্রপতি ওই বিলকে বাতিল করে দিতে পারেন।

(খ) স্থগিতমূলক ভেটো : যখন রাষ্ট্রপতি কোনো বিলকে সরাসরি নাকচ না-করে বিলটিকে পুনরায় বিবেচনা করার জন্য সংসদের কাছে পাঠিয়ে দেন, তখন সেই ভেটোকে বলা হয় স্থগিতমূলক ভেটো। স্থগিতমূলক ভেটোর ক্ষেত্রে বিলটি সরাসরি বাতিল হয়ে যায় না, বরং বলা যায়, বিলটিকে পুনরায় বিবেচনা করার সুযোগ থাকে। ওই বিলকে সংসদ যদি দ্বিতীয়বার রাষ্ট্রপতির সম্মতি লাভের জন্য পাঠায়, তাহলে সেক্ষেত্রে রাষ্ট্রপতি তাতে সম্মতি জানাতে বাধ্য থাকেন।

(গ) পকেট ভেটো : যখন রাষ্ট্রপতি কোনো বিলে সরাসরি অসম্মতি না-জানিয়ে অথবা বিলটি পুনরায় বিবেচনার জন্য সংসদে না-পাঠিয়ে অনির্দিষ্টকালের জন্য বিলটিতে সম্মতি না-জানিয়ে চেপে রেখে দেন, তখন তাকে বলে 'পকেট ভেটো'। উল্লেখযোগ্য যে, রাষ্ট্রপতির বিলে সম্মতিদানের জন্য সংবিধানে নির্দিষ্ট কোনো সময় বেঁধে দেওয়া হয়নি।

প্রশ্ন : ৩। ভারতের উপরাষ্ট্রপতির ওপর একটি টীকা লেখো।
[Write a note on the Vice-President of India.]

উত্তর। ভারতের উপরাষ্ট্রপতি

ভারতের উপরাষ্ট্রপতির স্থান পদমর্যাদাগত দিক থেকে রাষ্ট্রপতির পরেই। তিনি পদাধিকার বলে রাজ্যসভার সভাপতি।

❍ **যোগ্যতা :** উপরাষ্ট্রপতি পদপ্রার্থীকে কতকগুলি যোগ্যতার অধিকারী হতে হয়। এগুলি হল—

(ক) প্রার্থীকে অবশ্যই ভারতীয় নাগরিক হতে হবে।

(খ) বয়স হবে কমপক্ষে ৩৫ বছর।

(গ) প্রার্থীকে রাজ্যসভার সদস্য হওয়ার মতো যোগ্যতাসম্পন্ন হতে হবে।

(ঘ) প্রার্থী কেন্দ্রীয় সরকার অথবা রাজ্য সরকার অথবা স্থানীয় স্বায়ত্তশাসনমূলক সংস্থার অধীনে কোনোরকম লাভজনক পদে থাকবেন না।

(ঙ) উপরাষ্ট্রপতি পদে নির্বাচনপ্রার্থীকে কমপক্ষে ২০ জন নির্বাচক দ্বারা প্রস্তাবিত হতে হবে এবং একই সঙ্গে ২০ জন নির্বাচক দ্বারা ওই নাম সমর্থিত হতে হবে।

❍ **কার্যকাল :** উপরাষ্ট্রপতির কার্যকাল ৫ বছর। অর্থাৎ, তিনি ৫ বছরের জন্য নির্বাচিত হন; তিনি পুনরায় নির্বাচিত হতে পারেন।

○ **পদচ্যুতি :** উপরাষ্ট্রপতি তাঁর কার্যকাল শেষ হওয়ার আগেই পদত্যাগ করতে পারেন, অথবা কোনো কারণে তাঁকে পদচ্যুত করা যায়।

(ক) উপরাষ্ট্রপতিকে ইম্‌পিচমেন্ট পদ্ধতি প্রয়োগ করে পদচ্যুত করার কোনো প্রয়োজন নেই।

(খ) উপরাষ্ট্রপতিকে পদচ্যুত করতে হলে ১৪ দিন আগে রাজ্যসভায় একটি বিজ্ঞপ্তি দিতে হয়।

(গ) রাজ্যসভার অধিকাংশ সদস্যকে প্রস্তাবটি গ্রহণ করতে হবে।

(ঘ) রাজ্যসভায় প্রস্তাবটি গৃহীত হলে তা লোকসভা যদি সমর্থন করে, তাহলে উপরাষ্ট্রপতি পদচ্যুত হবেন।

○ **কার্যাবলি :** উপরাষ্ট্রপতির কাজগুলি হল—

(১) পদাধিকার বলে উপরাষ্ট্রপতি রাজ্যসভার সভাপতি হিসাবে কাজ করেন।

(২) রাষ্ট্রপতির কার্যকাল শেষ হওয়ার আগে যদি তাঁর মৃত্যু হয় অথবা তাঁকে পদচ্যুত করা হয় অথবা তিনি যদি পদত্যাগ করেন অথবা অপর কোনো কারণবশত রাষ্ট্রপতির পদটি যদি শূন্য হয়, তাহলে ওই শূন্যপদে উপরাষ্ট্রপতি— রাষ্ট্রপতি হিসাবে কাজ করবেন। ততদিনই তিনি এই কাজ করবেন, যতদিন কোনো নতুন রাষ্ট্রপতি নির্বাচিত হয়ে এসে কার্যভার গ্রহণ করছেন।

(৩) রাষ্ট্রপতি যদি অসুস্থ থাকেন অথবা কোনো কারণে তিনি যদি অনুপস্থিত থাকেন অথবা কোনো কারণে তৎকালীন সময়ে কাজ করতে অক্ষম হন, তাহলে যতদিন পর্যন্ত তিনি কার্যভার গ্রহণ না-করছেন, ততদিন উপরাষ্ট্রপতি তাঁর কাজ চালাবেন।

○ **পদমর্যাদা :** পদমর্যাদার দিক থেকে উপরাষ্ট্রপতি রাষ্ট্রপতির পরেই মর্যাদা ভোগ করেন। তিনি রাজ্যসভার চেয়ারম্যান মর্যাদায় ভূষিত হন। তবে রাষ্ট্রপতির কার্যাবলির ব্যাপারে তিনি বিশেষ মর্যাদার অধিকারী নন। কারণ, রাষ্ট্রপতির পদটি শূন্য না-হওয়া পর্যন্ত তিনি ওই পদের কোনো কাজ করতে পারেন না।

তা ছাড়া অনেকে এও মনে করেন যে, ভারতের রাষ্ট্রপতি যেখানে নিয়মতান্ত্রিক শাসক, সেখানে উপরাষ্ট্রপতির গুরুত্বপূর্ণ মর্যাদার কথা বলা যায় না।

প্রশ্ন : ৪। *ভারতের সংবিধানের ৩৬০ নং অনুচ্ছেদ বিষয়ে একটি টীকা লেখো।*

বিষয়ে আইন প্রণয়ন করতে পারে। তবে সংসদের
৬ সপ্তাহ তথা প্রায় ৪৫ দিনের মধ্যে অনুমোদিত হতে হবে, নতুবা অর্ডিন্যান্সটি বাতিল হ
যাবে।

বিভাগ-গ

অতি-সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর

প্রশ্ন : ১। *ভারতে কেন্দ্রীয় শাসনবিভাগ কাদের নিয়ে গঠিত হয়?*

উত্তর। ভারতে কেন্দ্রীয় শাসনবিভাগ গঠিত হয় যাদের নিয়ে, তাঁরা হলেন—রাষ্ট্রপতি, প্রধানমন্ত্রী
মন্ত্রীপরিষদ এবং কেন্দ্রের উচ্চপদস্থ স্থায়ী কর্মচারীবৃন্দ।

প্রশ্ন : ২। *ভারতের রাষ্ট্রপতি নির্বাচনের জন্য নির্বাচকমণ্ডলী বা electoral college কাদের নিয়ে গঠিত হয়?*

উত্তর। ভারতের রাষ্ট্রপতি নির্বাচনের জন্য যে নির্বাচকমণ্ডলী গঠিত হয়, তাতে থাকেন—
(ক) সংসদের দুটি কক্ষেরই নির্বাচিত সদস্যগণ; (খ) অঙ্গরাজ্যগুলির বিধানসভার নির্বাচি
সদস্যগণ।

প্রশ্ন : ৩। *রাষ্ট্রপতি নির্বাচনের সময় কী-কী নীতি মানতে হয়?*

উত্তর। রাষ্ট্রপতি নির্বাচনের সময় দুটি নীতি মানতে হয়। যথা— (ক) যাতে অঙ্গরাজ্যগুলি
প্রতিনিধিত্বের হার সমান হয় এবং (খ) অঙ্গরাজ্যগুলির বিধানসভাসমূহ কর্তৃক প্রদত্ত ভোট
সংখ্যা এবং পার্লামেন্টের ভোটসংখ্যার মধ্যে যেন সমতা বজায় থাকে।

প্রশ্ন : ৪। *ভারতের রাষ্ট্রপতি নির্বাচনের পদ্ধতিটির নাম কী?*

উত্তর। ভারতের রাষ্ট্রপতি নির্বাচনের পদ্ধতিকে বলে "একক-হস্তান্তরযোগ্য ভোট দ্বার
সমানুপাতিক প্রতিনিধিত্ব"-এর পদ্ধতি।

প্রশ্ন : ৫। *'কোটা' কাকে বলে?*

উত্তর। প্রথম পছন্দের বৈধ ভোটগুলিকে যোগ করে, যোগফলকে যদি ২ দিয়ে ভাগ করা হয়
তাহলে যে ভাগফল পাওয়া যাবে, সেই ভাগফলের সঙ্গে ১ যোগ করলে যে সংখ্যাটি পাওয়া
যাবে, তাকে বলা হয় 'কোটা'। অর্থাৎ

$$\text{কোটা} = \frac{\text{মোট বৈধ ভোটসংখ্যা}}{২} + ১$$

প্রশ্ন : ৬। *রাষ্ট্রপতি নির্বাচনে 'বৈধ ভোট' বলতে কী বোঝো?*

উত্তর। সমানুপাতিক প্রতিনিধিত্বের নিয়মানুসারে যত সংখ্যক প্রার্থী নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বী থাকে
তাদের প্রত্যেককে, প্রতিটি ভোটদাতা তার নিজ পছন্দ (Preference) জানাতে পারেন
ভোটদাতা এই পছন্দ জানাবেন ব্যালটে প্রতিদ্বন্দ্বীদের যে নামের তালিকা দেওয়া থাকে, তা
পাশে ১, ২, ৩, ৪ প্রভৃতি সংখ্যা লিখে। এক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য যে, ভোটদাতাকে প্রার্থীকে

(ক) জাতীয় জরুরি অবস্থা (৩৫২নং ধারা),
(খ) শাসনতান্ত্রিক অচলাবস্থা (৩৫৬নং ধারা),
(গ) আর্থিক জরুরি অবস্থা (৩৬০নং ধারা)।

প্রশ্ন : ১৬। *জাতীয় জরুরি অবস্থা বলতে কী বোঝো?*

উত্তর। ভারতের সংবিধানের ৩৫২নং ধারা অনুসারে রাষ্ট্রপতি যদি মনে করেন যে, যুদ্ধ, বহিরাক্রমণ অথবা দেশের মধ্যে সশস্ত্র কোনো বিদ্রোহজনিত কারণে সমগ্র ভারত বা ভারতের কোনো অংশের নিরাপত্তা বিঘ্নিত হয়েছে অথবা এরূপ ঘটার আশঙ্কা দেখা দিয়েছে, তাহলে তিনি সমগ্র দেশে বা সংশ্লিষ্ট অংশে জাতীয় জরুরি অবস্থা ঘোষণা করতে পারেন।

প্রশ্ন : ১৭। *জাতীয় জরুরি অবস্থা কতদিন বলবৎ থাকতে পারে?*

উত্তর। জাতীয় জরুরি অবস্থা অনুমোদিত হলে তা ৬ মাস পর্যন্ত কার্যকর থাকবে। সংসদে পুনরায় অনুমোদন পেলে ওই কার্যকাল আরও ৬ মাস বাড়ানো যাবে। কিন্তু জাতীয় জরুরি অবস্থা সর্বাধিক কতদিন পর্যন্ত কার্যকর রাখা যাবে, সে ব্যাপারে সংবিধানে নির্দিষ্ট করে কিছু বলা নেই।

প্রশ্ন : ১৮। *জাতীয় জরুরি অবস্থা ঘোষণার দুটি ফলাফল উল্লেখ করো।*

উত্তর। জাতীয় জরুরি অবস্থা ঘোষণার দুটি ফলাফল হল—

(ক) রাজ্য তালিকাভুক্ত যে-কোনো বিষয়ে সংসদ আইন প্রণয়ন করতে পারে। ওই বিষয়ে রাষ্ট্রপতি Ordinance ঘোষণা করতে পারেন।

(খ) এইসময়ে লোকসভার কার্যকাল ১ বছর করে বাড়ানো যেতে পারে।

প্রশ্ন : ১৯। *রাজ্যে শাসনতান্ত্রিক অচলাবস্থা বলতে কী বোঝো?*

উত্তর। ভারতীয় সংবিধানের ৩৫৬ নং ধারা অনুসারে রাষ্ট্রপতি যদি কোনো রাজ্যের রাজ্যপাল বা অন্য কোনো সূত্র থেকে জানতে পারেন যে, সংশ্লিষ্ট রাজ্যে সংবিধান অনুযায়ী শাসনব্যবস্থা পরিচালিত হচ্ছে না, তাহলে তিনি যে জরুরি অবস্থা সংক্রান্ত ঘোষণা জারি করেন, তাকে বলা হয় শাসনতান্ত্রিক অচলাবস্থা বা রাষ্ট্রপতির শাসন।

প্রশ্ন : ২০। *রাজ্যে শাসনতান্ত্রিক অচলাবস্থা কতদিন পর্যন্ত কার্যকর থাকে?*

উত্তর। রাজ্যে শাসনতান্ত্রিক অচলাবস্থা সংসদের উভয়কক্ষ দ্বারা অনুমোদিত হলে প্রথমে ৬ মাস তা কার্যকর থাকে এবং পরে আরও ৬ মাস তার মেয়াদ বাড়ানো যায়।

প্রশ্ন : ২১। *রাজ্যে শাসনতান্ত্রিক অচলাবস্থা ঘোষণার দুটি ফলাফল উল্লেখ করো।*

উত্তর। রাজ্যে শাসনতান্ত্রিক অচলাবস্থা ঘোষণার দুটি ফল হল—

(ক) রাজ্যে শাসনতান্ত্রিক অচলাবস্থা ঘোষিত হলে সংসদ রাজ্য আইনসভার ক্ষমতাবলি নিজ এক্তিয়ারে কার্যকর করবে।

(খ) কোনো রাজ্যে অচলাবস্থা ঘোষিত হলে সংসদ ওই রাজ্যের জন্য বাজেট ও অর্থবিল পাশ করতে পারে।

বিভাগ - ক

রচনাভিত্তিক প্রশ্নোত্তর

প্রশ্ন : ১। *একটি রাজ্যের রাজ্যপালের ক্ষমতা ও পদমর্যাদা আলোচনা করো।*
[Discuss the Powers and Position of the Governor of a State.]

উত্তর। রাজ্যপালের ক্ষমতা

অঙ্গরাজ্যের শাসনবিভাগীয় ক্ষমতার শীর্ষে আছেন রাজ্যপাল। রাজ্যের যাবতীয় শাসন-বিভাগীয় ক্ষমতা রাজ্যপালের ওপর আরোপিত এবং তাঁর নামেই রাজ্য সরকারের সকল কাজ গ্রহণ করা হয়। সাধারণত প্রতিটি অঙ্গরাজ্যে একজন করে রাজ্যপাল থাকেন। তবে ১৯৫৬ সালে একটি সংশোধনে বলা হয় যে, দুই বা তারও বেশি সংখ্যক রাজ্যের জন্য একজন রাজ্যপাল নিযুক্ত থাকতে পারেন (১৫৩নং ধারা)।

রাজ্যপালের ক্ষমতা ও কার্যাবলিকে পাঁচভাগে ভাগ করে আলোচনা করা যায়। যথা— (ক) শাসন-সংক্রান্ত ক্ষমতা, (খ) আইন-সংক্রান্ত ক্ষমতা, (গ) অর্থ-বিষয়ক ক্ষমতা, (ঘ) বিচার-সংক্রান্ত ক্ষমতা এবং (ঙ) স্বেচ্ছাধীন ক্ষমতা।

(ক) শাসন-সংক্রান্ত ক্ষমতা : রাজ্যপালগণের শাসন-সংক্রান্ত ক্ষেত্রে যেসব ক্ষমতা আছে, তা হল—

প্রথমত, রাজ্যের শাসনবিভাগের প্রধান হলেন রাজ্যপাল। তত্ত্বগতভাবে রাজ্যপালের নামে শাসন-সংক্রান্ত সকল কাজ পরিচালিত হয়।

দ্বিতীয়ত, রাজ্যপাল রাজ্যে নব-নির্বাচিত সংখ্যাগরিষ্ঠদের নেতা বা নেত্রীকে মুখ্যমন্ত্রী পদে নিয়োগ করেন। মুখ্যমন্ত্রীর পরামর্শ অনুসারে তিনি অন্যান্য মন্ত্রীদেরও নিয়োগ করেন। মন্ত্রীদের নিয়োগের সময় শপথ বাক্য পাঠ করানো তাঁর উল্লেখযোগ্য কাজ।

তৃতীয়ত, রাজ্যপাল অ্যাডভোকেট জেনারেল এবং রাজ্য পাবলিক সার্ভিস কমিশন-এর সদস্যদের নিয়োগ করেন। তবে তিনি পাবলিক সার্ভিস কমিশনের সদস্যদের পদচ্যুত করতে পারেন না। এই ক্ষমতা রাষ্ট্রপতির হাতে ন্যস্ত।

চতুর্থত, রাজ্যপাল হাইকোর্টের বিচারকদের নিয়োগ করার একক ক্ষমতার অধিকারী নন। এই নিয়োগের সময় রাষ্ট্রপতি তাঁর সঙ্গে পরামর্শ করে থাকেন।

পঞ্চমত, রাজ্যের শাসনকার্য সুষ্ঠুভাবে পরিচালনার জন্য তিনি প্রয়োজনীয় নিয়মাবলি প্রস্তুত করতে পারেন।

ষষ্ঠত, রাজ্য মন্ত্রীসভা যেসব বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেয়, মুখ্যমন্ত্রী সে সম্পর্কে রাজ্যপালকে জানান। আবার রাজ্যপাল যদি মন্ত্রীসভা দ্বারা গৃহীত প্রশাসনিক সিদ্ধান্তের তথ্যাদি সম্পর্কে মুখ্যমন্ত্রীর কাছে কিছু জানতে চান, সে সম্পর্কে তাঁকে তা জানানো মুখ্যমন্ত্রীর কর্তব্য।

সপ্তমত, কোনো রাজ্যের রাজ্যপাল যদি মনে করেন যে, ওই রাজ্যে সাংবিধানিক দিক থেকে অচলাবস্থা দেখা দিয়েছে, তাহলে তিনি তা রাষ্ট্রপতির কাছে জানান। রাষ্ট্রপতি সেই মতো ওই রাজ্যে জরুরি অবস্থা বা রাষ্ট্রপতির শাসন জারি করেন। এইসময় রাজ্যপাল কেন্দ্রীয় সরকারের 'এজেন্ট' হিসাবে সবরকম প্রশাসনিক কাজ পরিচালনা করার দায়িত্ব পান।

অষ্টমত, কেন্দ্রীয় বিশ্ববিদ্যালয় ব্যতীত সংশ্লিষ্ট রাজ্যের অন্যান্য বিশ্ববিদ্যালয়গুলির তিনি আচার্য হিসাবে দায়িত্ব পালন করেন।

(খ) আইনসংক্রান্ত ক্ষমতা : রাজ্যপালের আইন-বিষয়ক ক্ষমতাগুলি হল—

প্রথমত, রাজ্যপাল রাজ্য আইনসভার সদস্য নন, কিন্তু এর একটি অংশ—

দ্বিতীয়ত, রাজ্যপাল রাজ্য বিধানসভায় নতুন নির্বাচনের পর অধিবেশনের শুরুতে এবং প্রত্যেক বছর অধিবেশনের শুরুতে ভাষণ দেন। রাজ্য আইনসভার যৌথ অধিবেশনেও তিনি ভাষণ দেন এবং কেন যৌথ অধিবেশন ডাকা হল— তার কারণও তিনি ব্যাখ্যা করেন।

তৃতীয়ত, রাজ্যপাল রাজ্য আইনসভায় বার্তা (message) পাঠাতে পারেন।

চতুর্থত, রাজ্যপাল বিধানসভার অধিবেশন ডাকতে, বিধানসভা স্থগিত রাখতে এবং বিধানসভা ভেঙে দিতে পারেন।

পঞ্চমত, রাজ্য আইনসভায় কোনো বিল গৃহীত হলে তা আইনে পরিণত হওয়ার জন্য রাজ্যপালের সম্মতি প্রয়োজন। কোনো সাধারণ বিল রাজ্য আইনসভায় গৃহীত হওয়ার পর রাজ্যপালের কাছে পাঠানো হলে— (ক) তিনি যদি ওই বিলে সম্মতি জানান, তাহলে তা আইনে পরিণত হবে; (খ) তিনি যদি সম্মতি না-জানান, তাহলে তা বাতিল হয়ে যাবে; (গ) রাজ্যপালের কাছে পাঠানো বিলটি রাজ্যপাল যদি পুনর্বিবেচনার জন্য রাজ্য আইনসভায় পাঠিয়ে দেন এবং ওই বিলটি যদি পুনরায় গৃহীত হয় ও রাজ্যপালের সম্মতির জন্য পাঠানো হয়, তাহলে সেরূপ ক্ষেত্রে রাজ্যপাল ওই বিলে সম্মতি জানাতে বাধ্য থাকেন; (ঘ) আবার তিনি কোনো বিল রাষ্ট্রপতির সম্মতির জন্যও পাঠিয়ে দিতে পারেন। তবে অর্থবিলের ক্ষেত্রে রাজ্যপাল সম্মতি জানাতে বাধ্য থাকেন।

ষষ্ঠত, এমন কতকগুলি বিল আছে, যেগুলি রাজ্যপাল রাষ্ট্রপতির সম্মতির জন্য সংরক্ষণ করতে পারেন। এই বিলগুলি আইনে পরিণত হতে গেলে রাষ্ট্রপতির সম্মতি আবশ্যক। যেমন—(ক) হাইকোর্টের এক্তিয়ার ও মর্যাদাহানিকর বিল; (খ) রাজ্য আইনসভা যুগ্ম-তালিকাভুক্ত বিষয়ে যদি এমন কোনো বিল পাশ করে, যা সংসদ দ্বারা গৃহীত আইনের বিরোধী; (গ) কেন্দ্রীয় আইনসভা যদি কোনো দ্রব্যকে 'অত্যাবশ্যক' বলে ঘোষণা করে, অথচ রাজ্য আইনসভা যদি ওই দ্রব্যের ওপর কর-আরোপ-সংক্রান্ত কোনো বিল পাশ করে;

(ঘ) রাজ্য আইনসভা দ্বারা যদি বাধ্যতামূলকভাবে সম্পত্তি-অধিগ্রহণ-সংক্রান্ত বিল গৃহীত হয়, তাহলে সেইসব ক্ষেত্রে রাজ্যপাল তা রাষ্ট্রপতির বিবেচনার জন্য পাঠাতে পারেন।

সপ্তমত, রাজ্যপালের জরুরি আইন (ordinance) জারির ক্ষমতা আছে। যখন রাজ্য আইনসভার অধিবেশন বন্ধ থাকে, তখন প্রয়োজন মনে করলে রাজ্যপাল ordinance জারি করতে পারেন। আইনসভা দ্বারা প্রণীত আইনের মতোই এই ordinance কাজ করে। তবে পুনরায় আইনসভার অধিবেশন শুরু হলে ছয় সপ্তাহ তা কার্যকর থাকে এবং ওই সময়ের মধ্যে আইনসভা দ্বারা অনুমোদিত না-হলে তা বাতিল হয়ে যাবে।

অষ্টমত, রাজ্যপাল রাজ্য আইনসভায় বার্ষিক আর্থিক বিবরণী পেশ করতে পারেন।

নবমত, তাঁর ব্যয়মঞ্জুরি দাবি করার ক্ষমতা আছে। তাঁর অনুমতি অনুসারে অর্থবিল ও বাজেট রাজ্য বিধানসভায় পেশ করতে হয়।

(গ) অর্থ-বিষয়ক ক্ষমতা : রাজ্যপালের অর্থ-বিষয়ক বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ ক্ষমতা বিদ্যমান। যেমন–

প্রথমত, রাজ্যপালের পক্ষ থেকে রাজ্যের অর্থমন্ত্রী প্রত্যেক আর্থিক বছর-এ রাজ্য সরকারের আয়-ব্যয়ের একটি বিবরণী রাজ্য বিধানসভায় পেশ করেন (২০২নং ধারা)।

দ্বিতীয়ত, রাজ্য আইনসভায় কোনো ব্যয়-বরাদ্দের দাবি পেশ করতে হলে রাজ্যপালের সম্মতি প্রয়োজন। তা ছাড়া রাজ্য আইনসভায় অর্থ-সংক্রান্ত কোনো বিল উত্থাপনের ক্ষেত্রেও রাজ্যপালের সম্মতি প্রয়োজন।

তৃতীয়ত, রাজ্যের আকস্মিক ব্যয় তহবিল থেকে রাজ্যপাল ব্যয়নির্বাহের জন্য ব্যবস্থা নিতে পারেন। উল্লেখযোগ্য যে, এই ব্যয়নির্বাহের ব্যবস্থা তিনি করতে পারলেও পরে তা রাজ্য আইনসভা দ্বারা অনুমোদিত হতে হবে।

(ঘ) বিচার-সংক্রান্ত ক্ষমতা : বিচার-সংক্রান্ত ক্ষেত্রে রাজ্যপালের উল্লেখযোগ্য কার্যাবলি হল–

প্রথমত, সংবিধানের ১৬১নং ধারা অনুসারে রাজ্যের আইন-সংক্রান্ত ক্ষমতা যে বিষয়ে প্রসারিত, সেইসব বিষয়সংক্রান্ত কোনো আইন ভঙ্গের অপরাধে অপরাধী সাব্যস্ত কোনো ব্যক্তির শাস্তি মার্জনা করতে পারেন, স্থগিত রাখতে পারেন বা শাস্তি লঘু করতে পারেন।

দ্বিতীয়ত, হাইকোর্ট ছাড়া অন্যান্য নিম্নতন আদালতগুলির বিচারপতিদের রাজ্যপাল নিয়োগ করতে পারেন। তবে এই নিয়োগ ও পদোন্নতির ব্যাপারে তিনি উচ্চ আদালতের সঙ্গে পরামর্শ করে নেবেন।

তৃতীয়ত, রাজ্য হাইকোর্টের বিচারকদের নিয়োগ করার একক ক্ষমতা রাজ্যপালের নেই। এই নিয়োগের ব্যাপারে রাষ্ট্রপতি রাজ্যপালের সঙ্গে পরামর্শ করে।

(ঙ) স্বেচ্ছাধীন ক্ষমতা : রাজ্যপালের এমন কিছু ক্ষমতা আছে, যেগুলি প্রয়োগের সময় সংশ্লিষ্ট রাজ্যের মন্ত্রীসভার সঙ্গে পরামর্শ করতে বাধ্য নন এবং যেসব ক্ষমতার ক্ষেত্রে রাজ্যপালের সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত। ওই সিদ্ধান্তের বৈধতার ব্যাপারে কোনোরকম প্রশ্ন আদালতে তোলা যাবে না। এই ধরনের ক্ষমতাকে বলে স্বেচ্ছাধীন ক্ষমতা। রাজ্যপালের স্বেচ্ছাধীন ক্ষমতাগুলি হল—

প্রথমত, অসমের রাজ্যপাল সংবিধানের ষষ্ঠ তপশিল অনুযায়ী খনিজগুলির রয়্যালটি জেলা পরিষদগুলিকে কতটা পরিমাণে দেওয়া হবে, অসমের রাজ্য সরকারকে সে ব্যাপারে নির্দেশ দিতে পারেন।

দ্বিতীয়ত, রাষ্ট্রপতি যদি কোনো রাজ্যের রাজ্যপালকে সংশ্লিষ্ট রাজ্যের পার্শ্ববর্তী কোনো কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলের প্রশাসক হিসাবে নিযুক্ত করেন, তাহলে ওই রাজ্যপাল ওই রাজ্যের

মন্ত্রীসভার সহযোগিতা ও পরামর্শ ছাড়াই দায়িত্বপ্রাপ্ত কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলটির শাসনমূলক কাজ পরিচালনা করতে পারেন।

এইসব কাজ ছাড়াও রাজ্যপালকে আবার এমন কতকগুলি কাজ করতে হয়; যেগুলি 'বিশেষ দায়িত্ব' হিসাবে তাঁর হাতে অর্পিত হয়েছে। এর অর্থ হল— ওইসব 'বিশেষ দায়িত্ব'-সম্পন্ন কাজ তাঁর স্বেচ্ছাধীন কাজ হিসাবেই পরিগণিত। কারণ, এইসব 'বিশেষ দায়িত্ব'-সম্পন্ন কাজগুলির ক্ষেত্রে তিনি মন্ত্রীপরিষদের সঙ্গে পরামর্শ করলেও তাঁর সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত এবং এ-ব্যাপারে আদালতে কোনো প্রশ্ন তোলা যাবে না। এই কাজগুলি হল—

(ক) সংবিধানের ৩৭১(২) নং ধারায় উল্লেখ করা হয়েছে যে, রাষ্ট্রপতির নির্দেশ অনুসারে মহারাষ্ট্র বা গুজরাটের রাজ্যপালগণ ওইসব রাজ্যের কতকগুলি এলাকার (যেমন– বিদর্ভ ও সৌরাষ্ট্রের) উন্নতিবিধানের ব্যবস্থা নেবেন।

(খ) সংবিধানের ৩৭১ক(১)(খ) ধারায় বলা হয়েছে যে, নাগাল্যান্ডের রাজ্যপাল, যতদিন পর্যন্ত ওই রাজ্যে বিদ্রোহী নাগাদের অভ্যন্তরীণ গোলযোগ চলবে, ততদিন রাজ্যের আইনশৃঙ্খলা রক্ষার 'বিশেষ দায়িত্ব' পালন করবেন।

(গ) সংবিধানের ৩৭১গ(১) ধারায় বলা হয়েছে যে, মণিপুর রাজ্যের পার্বত্য অঞ্চল থেকে যেসব নির্বাচিত ব্যক্তিদের নিয়ে বিধানসভা কমিটি গঠিত হবে, তা যাতে যথাযথভাবে কাজ করতে পারে, সে ব্যাপারে রাষ্ট্রপতি রাজ্যপালের ওপর 'বিশেষ দায়িত্ব' অর্পণ করতে পারেন।

(ঘ) ১৯৭৫ খ্রিস্টাব্দের ৩৬-তম সংবিধান সংশোধন অনুসারে স্থির হয় যে, সিকিমের শান্তিরক্ষার ব্যাপারে ও সেখানকার বিভিন্ন শ্রেণির মানুষের সামাজিক ও আর্থিক উন্নয়নের উদ্দেশ্যে যথাযথ ব্যবস্থা নেওয়ার জন্য সিকিমের রাজ্যপালের ওপর 'বিশেষ দায়িত্ব' অর্পণ করা হয়েছে।

সরকার
অতএব বলা যায় যে, রাজ্যপাল হলেন রাজ্যের আনুষ্ঠানিক প্রধান এবং কেন্দ্রের প্রতিনিধি— উভয়ই। রাজ্যগুলির ওপর কেন্দ্র রাজ্যপাল দ্বারা তার নিয়ন্ত্রণ বজায় রাখে।

প্রশ্ন : ২। *একটি রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীর ক্ষমতা ও পদমর্যাদা আলোচনা করো।*
[Discuss the Powers and Position of the Chief Minister of a State.]

উত্তর। মুখ্যমন্ত্রীর ক্ষমতা

ভারতে কোনো অঙ্গরাজ্যের প্রকৃত প্রধান শাসক হলেন মুখ্যমন্ত্রী। কেন্দ্রে প্রধানমন্ত্রী যেরূপ ক্ষমতা ও পদমর্যাদার অধিকারী, রাজ্যে মুখ্যমন্ত্রীও অনুরূপ ক্ষমতা ও পদমর্যাদার অধিকারী। সংবিধানের ১৬৪ (১)নং ধারা অনুযায়ী মুখ্যমন্ত্রীকে নিয়োগ করেন সেই রাজ্যের রাজ্যপাল। রাজ্যপাল বিধানসভার সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের নেতা বা নেত্রীকে মুখ্যমন্ত্রী হিসাবে নিয়োগ করেন। তবে এমন কোনো সদস্যকে রাজ্যপাল যদি মুখ্যমন্ত্রী পদে নিয়োগ করেন, যিনি রাজ্য আইনসভায় নির্বাচিত কোনো ব্যক্তি নন, তাহলে তাঁকে সংবিধান অনুসারে ৬ মাসের মধ্যে বিধানসভার সদস্য নির্বাচিত হতে হবে, নতুবা তিনি পদচ্যুত হবেন। আবার কোনো দল যদি এককভাবে সংখ্যাগরিষ্ঠতা না-পায়, তাহলে সেক্ষেত্রে রাজ্যপাল তাঁর স্বেচ্ছাধীন ক্ষমতা অনুযায়ী বৃহত্তম দল বা জোটের নেতাকে মুখ্যমন্ত্রী পদে নিয়োগ করলে ওই মুখ্যমন্ত্রীকে একটি নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে তাঁর সংখ্যাগরিষ্ঠতার প্রমাণ দিতে হবে।

মুখ্যমন্ত্রীর ক্ষমতা ও কার্যাবলিকে চারভাগে ভাগ করে আলোচনা করা যায়। যথা— (ক) মুখ্যমন্ত্রী হলেন রাজ্যপালের পরামর্শদাতা, (খ) মুখ্যমন্ত্রী হলেন রাজ্য মন্ত্রীসভার নেতা বা নেত্রী, (গ) মুখ্যমন্ত্রী হলেন রাজ্যের বিধানসভার নেতা এবং (ঘ) মুখ্যমন্ত্রী রাজ্যের জনগণের নেতা।

(ক) মুখ্যমন্ত্রী হলেন রাজ্যপালের পরামর্শদাতা :

(১) মুখ্যমন্ত্রী হলেন রাজ্যপালের প্রধান পরামর্শদাতা।

(২) রাজ্যপাল এবং মন্ত্রীপরিষদের মধ্যে যোগাযোগের মাধ্যম হিসাবে মুখ্যমন্ত্রী কাজ করেন।

(৩) রাজ্যপালের সঙ্গে সচিবদের যথারীতি সাক্ষাৎকারের ব্যবস্থা মুখ্যমন্ত্রী করিয়ে দিতে পারেন।

(৪) রাজ্য আইনসভার অধিবেশন ডাকার ব্যাপারে অথবা অধিবেশনের সমাপ্তি ঘোষণার ব্যাপারে অথবা রাজ্যবিধানসভার সময়সীমা শেষ হওয়ার আগেই বিধানসভা ভেঙে দেওয়ার ব্যাপারে রাজ্যপালকে মুখ্যমন্ত্রী পরামর্শ দিয়ে থাকেন। উল্লেখযোগ্য যে, মন্ত্রীপরিষদের সিদ্ধান্ত অনুসারেই এ ব্যাপারে রাজ্যপালকে মুখ্যমন্ত্রী পরামর্শ দেবেন।

(৫) শাসন-সংক্রান্ত কার্যাবলির পরিচালনা-সংক্রান্ত ব্যাপারে মন্ত্রীসভার সকল সিদ্ধান্ত মুখ্যমন্ত্রী রাজ্যপালকে জানান। তা ছাড়া, রাজ্যপালও ওই সংক্রান্ত কোনো বিষয়ে মুখ্যমন্ত্রীর কাছে জানতে চাইতে পারেন। মুখ্যমন্ত্রীর কর্তব্য হল সংশ্লিষ্ট বিষয়টি সম্পর্কে রাজ্যপালকে জানানো।

(খ) মুখ্যমন্ত্রী হলেন রাজ্য মন্ত্রীসভার নেতা বা নেত্রী :

(১) বিধানসভায় নির্বাচিত সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের নেতা বা নেত্রীকে মুখ্যমন্ত্রীরূপে নিয়োগের

পর মুখ্যমন্ত্রী অন্যান্য মন্ত্রীদের মনোনয়ন করেন এবং অন্যান্য মন্ত্রীদের যে নামের তালিকা তিনি রাজ্যপালকে দেন, সেই তালিকা অনুসারেই রাজ্যপাল তাঁদের নিয়োগ করেন।

(২) মন্ত্রীসভায় কাদের নেওয়া হবে, কোন্ মন্ত্রীকে কোন্ দপ্তর দেওয়া হবে, কে কোন্ পর্যায়ের দায়িত্ব পাবেন, মুখ্যমন্ত্রী তা ঠিক করে দেন।

(৩) সরকারের প্রধান হিসাবে মুখ্যমন্ত্রী মন্ত্রীদের মধ্যে দপ্তর পুনর্বণ্টন করে দেন। কোনো মন্ত্রীকে অপসারণ করার ব্যাপারে অথবা মন্ত্রীপরিষদের পুনর্গঠনের ব্যাপারে প্রধান দায়িত্ব পালন করেন মুখ্যমন্ত্রী।

(৪) রাজ্য মন্ত্রীসভার কেন্দ্রবিন্দু হলেন মুখ্যমন্ত্রী। মন্ত্রীসভার উত্থান-পতন মুখ্যমন্ত্রীকে ঘিরে।

(৫) কোনো মন্ত্রীর সঙ্গে যদি মুখ্যমন্ত্রীর বিরোধ দেখা দেয়, তাহলে উক্ত মন্ত্রীকে পদচ্যুত হতে হয়।

(৬) সকল বিভাগের কাজের মধ্যে মুখ্যমন্ত্রী সমন্বয়সাধন করেন এবং সেই সঙ্গে দপ্তরগুলির কার্যাবলির তিনি তদারকি করেন।

(৭) মন্ত্রীসভার বৈঠকে মুখ্যমন্ত্রী সভাপতিত্ব করেন এবং তাঁর সভাপতিত্বেই সমস্ত সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। মন্ত্রীসভার কর্মসূচিতে কী-কী থাকবে বা কোন্ কোন্ বিষয় নিয়ে আলোচনা হবে, তা ঠিক করেন মুখ্যমন্ত্রী।

(৮) যদি মন্ত্রীসভায় সরকারি নীতি নিয়ে কোনো বিরোধ দেখা দেয়, তাহলে তার মীমাংসাও মুখ্যমন্ত্রীকে করতে হয়। কারণ, মন্ত্রীসভার মধ্যে তিনিই সংহতি ও ঐক্য রক্ষা করেন।

(৯) সরকারি নীতি অনুসরণ করে কোনো মন্ত্রী যদি কাজ না-করেন, তাহলে তাঁকে মুখ্যমন্ত্রী পদচ্যুত করতে পারেন।

(গ) মুখ্যমন্ত্রী হলেন রাজ্যের বিধানসভার নেতা :

(১) রাজ্য বিধানসভার অধিবেশন আহ্বান, স্থগিত ও প্রয়োজনে তা ভেঙে দেওয়ার ব্যাপারে মুখ্যমন্ত্রী রাজ্যপালকে পরামর্শ দিয়ে থাকেন। এইসব ব্যাপারে রাজ্যপালের ক্ষমতা আনুষ্ঠানিক মাত্র। তিনি মুখ্যমন্ত্রীর পরামর্শমতো কাজ করেন।

(২) মুখ্যমন্ত্রী রাজ্যের অভ্যন্তরীণ নীতি গ্রহণের ব্যাপারে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নিয়ে থাকেন। তবে বৈদেশিক নীতি গ্রহণের ব্যাপারে তিনি চূড়ান্ত সিদ্ধান্তের অধিকারী নন।

(৩) মুখ্যমন্ত্রী বিধানসভায় সরকারি নীতি সম্পর্কে ব্যাখ্যা দেন। এ ব্যাপারে তিনি রাজ্যসরকারের প্রধান মুখপাত্র হিসাবে কাজ করে থাকেন।

(৪) রাজ্য মন্ত্রীসভা যেসব কাজ করে বা সিদ্ধান্ত নেয়, সেইসব ব্যাপারে মুখ্যমন্ত্রী বিধানসভার কাছে দায়বদ্ধ থাকেন।

(৫) বিধানসভায় বিতর্ক চলাকালীন সময়ে সাধারণত কোনো মন্ত্রী যদি বিতর্কিত বিষয়টি সম্পর্কে কোনোরূপ অসুবিধার সম্মুখীন হয়ে পড়েন, তাহলে মুখ্যমন্ত্রী তাঁকে সাহায্য করেন।

(৬) বিরোধীপক্ষের সঙ্গে সদ্ভাব রক্ষা করে চলা এবং যথাযথভাবে আইনসভার কাজ যাতে চলতে পারে, সেসব দিকে লক্ষ রাখা মুখ্যমন্ত্রীর কাজ।

(৭) আইনসভায় কোনো গুরুত্বপূর্ণ বিল মুখ্যমন্ত্রীই পাশ করানোর দায়িত্ব গ্রহণ করেন। যদি রাজ্য আইনসভার সঙ্গে মুখ্যমন্ত্রী বা মন্ত্রীসভার সঙ্গে রাজ্য আইনসভার কোনো বিরোধ বাধে, তাহলে রাজ্যপালকে মুখ্যমন্ত্রী বিধানসভা ভেঙে দেওয়ার জন্য পরামর্শ দিতে পারেন।

(ঘ) মুখ্যমন্ত্রী হলেন রাজ্যের জনগণের নেতা :

(১) মুখ্যমন্ত্রী হলেন সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের নেতা, রাজ্যের প্রকৃত শাসকপ্রধান এবং তিনি রাজ্যের জনগণের নেতা বা নেত্রী।

(২) রাজ্যের জনগণের সমর্থন দ্বারা তাঁর মর্যাদা সুদৃঢ় থাকে।

(৩) মুখ্যমন্ত্রী সর্বদা সরকারি নীতি ও কার্যাবলির মাধ্যমে এবং সরকারি নীতির প্রয়োগের মাধ্যমে জনসমর্থন ধরে রাখার চেষ্টা করেন।

(৪) সরকারের সপক্ষে যাতে জনসমর্থন থাকে, তার দিকে তিনি নজর রাখেন। এক্ষেত্রে তাঁর বিচক্ষণ পদক্ষেপ ও দক্ষতা বিশেষভাবে কার্যকর।

● মুখ্যমন্ত্রীর পদমর্যাদা :

মুখ্যমন্ত্রীর কার্যাবলি থেকে এ কথা স্পষ্ট যে, তাঁর ক্ষমতা ও দায়িত্ব ব্যাপক। রাজ্যের শাসন-কাঠামোর ভিত্তি হলেন মুখ্যমন্ত্রী। সুতরাং, মুখ্যমন্ত্রীর নিজস্ব গুণ, ব্যক্তিত্ব, বিচক্ষণতা ও দক্ষতার ওপর তাঁর পদমর্যাদা নির্ভরশীল। কোনো রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীর পদমর্যাদা আরও কতকগুলি বিষয়ের ওপর নির্ভর করে। যথা—

(ক) কেন্দ্রের সঙ্গে ওই রাজ্যের সম্পর্ক কতখানি স্বাভাবিক তার ওপর;

(খ) তাঁর ব্যক্তিগত যোগ্যতা দ্বারা দলের মধ্যে কতখানি প্রভাব তিনি ফেলতে পেরেছেন;

(গ) কেন্দ্র ও সংশ্লিষ্ট রাজ্যে যে দলব্যবস্থা রয়েছে, তার সঙ্গে তিনি কতখানি সংশ্লিষ্ট প্রভৃতি।

রাজ্য মন্ত্রীসভার গঠন ও কার্যাবলি আলোচনা করো।

বিভাগ - গ

অতি-সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর

প্রশ্ন : ১। *কোনো অঙ্গরাজ্যের প্রধান শাসক কে?*

উত্তর। কোনো অঙ্গরাজ্যের প্রধান শাসক হলেন রাজ্যপাল।

প্রশ্ন : ২। *রাজ্যপাল কার দ্বারা নিযুক্ত হন?*

উত্তর। রাজ্যপাল নিযুক্ত হন রাষ্ট্রপতি দ্বারা।

প্রশ্ন : ৩। *রাজ্যপালের কার্যকাল কত?*

উত্তর। রাজ্যপাল সাধারণত পাঁচ বছরের জন্য নিযুক্ত হন। তিনি পুনরায় নির্বাচিত হতে পারেন। তবে রাষ্ট্রপতির সন্তুষ্টির ওপর তাঁর কার্যকাল নির্ভর করে।

প্রশ্ন : ৪। *রাজ্যপালের নিয়োগের ব্যাপারে যে দুটি প্রথা মেনে চলা হয়, সেই দুটি প্রথা কী-কী?*

উত্তর। রাজ্যপালের নিয়োগের ব্যাপারে যে দুটি প্রথা মেনে চলা হয় — (ক) যে রাজ্যে রাজ্যপাল নিযুক্ত হবেন, সেই রাজ্যের তিনি বাসিন্দা হবেন না। (খ) যে রাজ্যে রাজ্যপাল নিযুক্ত হবেন, রাষ্ট্রপতি সাধারণত সেই রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে পরামর্শ করে নেবেন।

প্রশ্ন : ৫। *রাজ্যপালের কী-কী যোগ্যতা থাকা উচিত?*

উত্তর। সংবিধান অনুসারে যেসব যোগ্যতা রাজ্যপালের থাকা উচিত, তা হল—

(ক) তাঁকে ভারতীয় নাগরিক হতে হবে।
(খ) বয়স হতে হবে কমপক্ষে ৩৫ বছর।
(গ) তিনি সংসদ কিংবা রাজ্য আইনসভার সদস্য থাকতে পারবেন না।
(ঘ) তিনি কোনো লাভজনক পদে অধিষ্ঠিত থাকবেন না।

প্রশ্ন : ৬। *রাজ্যপালগণ যেসব বিশেষ সুযোগ-সুবিধা ভোগ করেন, তার মধ্যে দুটির উল্লেখ করো।*

উত্তর। রাজ্যপালগণ কতকগুলি ক্ষেত্রে বিশেষ সুযোগ-সুবিধা ভোগ করেন। এগুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য দুটি সুযোগ-সুবিধা হল—(ক) রাজ্যপাল পদে ক্ষমতাসীন থাকাকালীন অবস্থায় তাঁর বিরুদ্ধে কোনোরূপ ফৌজদারি মামলা আনা যাবে না। (খ) তাঁরা তাঁদের কাজের জন্য আদালতের কাছে কৈফিয়ৎ দিতে বাধ্য থাকবেন না।

প্রশ্ন : ৭। *রাজ্যপালের দুটি শাসন-সংক্রান্ত ক্ষমতা উল্লেখ করো।*

উত্তর। রাজ্যপালের দুটি শাসনতান্ত্রিক ক্ষমতা হল—

(ক) রাজ্যপালের নামে রাজ্যের সকল শাসনকার্য পরিচালিত হয়। তিনি রাজ্যের সমস্ত শাসনকার্য যথাযথভাবে ও সুষ্ঠু প্রক্রিয়ায় পরিচালনার জন্য নিয়মাবলি প্রণয়ন করতে পারেন।

(খ) তিনি বিধানসভার সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের নেতাকে মুখ্যমন্ত্রী পদে নিয়োগ করতে পারেন এবং মুখ্যমন্ত্রীর পরামর্শক্রমে অন্যান্য মন্ত্রীদের নিয়োগ করতে পারেন।

প্রশ্ন : ৮। *রাজ্যপালের দুটি আইন-সংক্রান্ত ক্ষমতা উল্লেখ করো।*

উত্তর। রাজ্যপালের আইন-সংক্রান্ত দুটি ক্ষমতা হল—

(ক) এক-কক্ষবিশিষ্ট রাজ্য আইনসভার ক্ষেত্রে রাজ্যপাল যদি মনে করেন যে, বিধান সভায় ইঙ্গ-ভারতীয় সম্প্রদায় যথেষ্ট সংখ্যক তাঁদের প্রতিনিধি পাঠাতে সক্ষম হয়নি, তাহলে ওই সম্প্রদায় থেকে উপযুক্ত সংখ্যক প্রতিনিধি তিনি বিধানসভায় পাঠাতে পারেন।

(খ) রাজ্য আইনসভা দ্বারা গৃহীত বিল আইনে পরিণত হতে গেলে রাজ্যপালের সম্মতি প্রয়োজন। রাজ্যপাল বিলে সম্মতি জানালে বিলটি আইনে পরিণত হবে; সম্মতি না-জানালে বিলটি বাতিল হয়ে যাবে। কোনো কোনো বিলের ক্ষেত্রে তিনি আইনসভায় পুনর্বিবেচনার জন্য পাঠাতে পারেন; আবার কোনো কোনো বিল রাষ্ট্রপতির সম্মতির জন্য পাঠাতে পারেন।

প্রশ্ন : ৯। *রাজ্যপালের অর্থ-সংক্রান্ত ক্ষমতা উল্লেখ করো।*

উত্তর। রাজ্যপালের অর্থ-সংক্রান্ত ক্ষমতা হল—

(ক) রাজ্য আইনসভায় ব্যয়বরাদ্দের কোনো দাবি কিংবা অর্থসংক্রান্ত কোনো বিল উত্থাপন করতে গেলে রাজ্যপালের সম্মতি প্রয়োজন।

(খ) রাজ্য সরকারের আনুমানিক আয়-ব্যয়-সংক্রান্ত বার্ষিক বিবরণী রাজ্যপালের পক্ষ থেকে সংশ্লিষ্ট রাজ্যের অর্থমন্ত্রী বিধানসভায় পেশ করেন।

(গ) রাজ্যে কোনো ব্যয়নির্বাহ রাজ্যপাল আকস্মিক ব্যয় তহবিল থেকে মনজুর করতে পারেন। এই মনজুরি অবশ্য পরে ওই রাজ্য আইনসভা দ্বারা অনুমোদিত হতে হবে।

প্রশ্ন : ১০। *রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী ও অন্যান্য মন্ত্রীদের কে পদচ্যুত করতে পারেন?*

উত্তর। রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী ও অন্যান্য মন্ত্রীদের রাজ্যপাল পদচ্যুত করতে পারেন।

প্রশ্ন : ১১। *রাজ্যপালের দুটি বিচার-সংক্রান্ত ক্ষমতা উল্লেখ করো।*

উত্তর। রাজ্যপালের বিচার-সংক্রান্ত দুটি ক্ষমতা হল—

(ক) কোনো রাজ্যের হাইকোর্টের বিচারপতিদের নিয়োগ করেন রাষ্ট্রপতি। এই নিয়োগের সময় তিনি ওই রাজ্যের রাজ্যপালের সঙ্গে পরামর্শ করে নেন।

(খ) হাইকোর্ট ছাড়া অন্যান্য অধস্তন আদালতের বিচারপতিদের নিয়োগ করেন সংশ্লিষ্ট রাজ্যের রাজ্যপাল। এইসব বিচারপতিদের নিয়োগ ও পদোন্নতির সময় তিনি উচ্চ আদালতের সঙ্গে পরামর্শ করে নেন।

প্রশ্ন : ১২। *রাজ্যপালের স্বেচ্ছাধীন ক্ষমতা বলতে কী বোঝো?*

উত্তর। রাজ্যপালের এমন কিছু ক্ষমতা আছে, যেগুলি প্রয়োগের সময় সংশ্লিষ্ট রাজ্যের মন্ত্রীসভার সঙ্গে পরামর্শ করতে তিনি বাধ্য নন এবং যেসব ক্ষমতার ক্ষেত্রে রাজ্যপালের সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত; ওই সিদ্ধান্তের বৈধতার ব্যাপারে কোনোরকম প্রশ্ন আদালতে তোলা যাবে না। একে বলে স্বেচ্ছাধীন ক্ষমতা।

প্রশ্ন : ১৩। *রাজ্যপালের দুটি স্বেচ্ছাধীন ক্ষমতা উল্লেখ করো।*

উত্তর। রাজ্যপালের দুটি স্বেচ্ছাধীন ক্ষমতা হল—

(ক) অসমের রাজ্যপাল, সংবিধানের ষষ্ঠ তপশিল অনুযায়ী খনিজগুলির রয়্যালটি জেলা পরিষদগুলিকে কতটা পরিমাণে দেওয়া হবে, অসমের রাজ্য সরকারকে সে ব্যাপারে নির্দেশ দিতে পারেন।

(খ) রাষ্ট্রপতি যদি কোনো রাজ্যের রাজ্যপালকে সংশ্লিষ্ট রাজ্যের পার্শ্ববর্তী কোনো কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলের প্রশাসক হিসাবে নিযুক্ত করেন, তাহলে ওই রাজ্যপাল ওই রাজ্যের মন্ত্রীসভার সহযোগিতা ও পরামর্শ ছাড়াই দায়িত্বপ্রাপ্ত কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলটির শাসনমূলক কাজ পরিচালনা করতে পারেন।

প্রশ্ন : ১৪। *কোনো রাজ্যের আইনসভার অধিবেশন আহ্বান কে করতে পারেন?*

উত্তর। কোনো রাজ্যের আইনসভার অধিবেশন আহ্বান করতে পারেন মুখ্যমন্ত্রীর পরামর্শ অনুসারে রাজ্যপাল।

প্রশ্ন : ১৫। *রাজ্য আইনসভা দ্বারা গৃহীত কোনো বিল আইনে পরিণত হতে গেলে কার সম্মতি নিতে হয়?*

উত্তর। রাজ্য আইনসভা দ্বারা গৃহীত কোনো বিল আইনে পরিণত হতে গেলে সংশ্লিষ্ট রাজ্যের রাজ্যপালের সম্মতি প্রয়োজন হয়।

প্রশ্ন : ১৬। *এমন দুটি ক্ষমতা উল্লেখ করো, যেখানে রাজ্যপাল তাঁর নিজ বিচারবুদ্ধি অনুযায়ী দায়িত্ব পালন করে থাকেন।*

উত্তর। কতকগুলি ক্ষেত্র আছে, যেখানে রাজ্যপাল তাঁর নিজ বিচার-বুদ্ধি অনুযায়ী দায়িত্ব পালন করে থাকেন। যথা—

(ক) কোনো রাজ্যের রাজ্যপাল সেই রাজ্যের আইন ও শাসন-সংক্রান্ত ব্যাপারে তথ্য ও রিপোর্ট জানানোর জন্য মুখ্যমন্ত্রীকে নির্দেশ দেওয়ার অধিকারী।

(খ) যদি কোনো রাজ্যে রাষ্ট্রপতির শাসন চালু থাকে, তাহলে সেই রাজ্যের রাজ্যপাল রাষ্ট্রপতির প্রতিনিধি হিসাবে শাসন পরিচালনা করবেন।